প্রিন্সিপাল ডাওনিং ও আমাদের ল্যাবের গবেষনা

সব্যসাচী সরকার

প্রায় পনেরো মাসের প্রচেষ্ঠায় বেসু মানে শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ যা এখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিয়ুট অফ ইঞ্জিনীয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি-শিবপুর নামে পরিচিত সেখানে আমার গবেষনার জন্য একটা ল্যাবোরেটরী তৈরী করিয়ে নিতে পারলাম। অনেকেই এক এমেরীটাস অধ্যাপকের জন্য এটা হওয়াতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের ভাবনাটা অনেকটা - এমেরীটাস অধ্যাপক, একটা এসী যুক্ত বসার ঘর আর টেবিল-চেয়ার, কমপ্উিটার ও একটা টেলিফোন এই পর্য্যাপ্ত । সপ্তাহে ক্লাস নেবার অবসর সময়ে দু- একদিন কয়েক ঘন্টা বসবেন আর ইনস্টিটিয়ুটের সেমিনার ও কনফারেন্সে প্রথম সারিতে বসে বিশেষ আমন্ত্রিতদের সঙ্গে অতীতের ও বর্তমানের খবরের কাগজে প্রকাশিত কল্পলোকের প্রযুক্তি তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার চিত্রনের আলোচনাতে কিছুক্ষন ব্যস্ত থাকবেন। এ রকম এক ছকে বাঁধা কাজের রূটিন থেকে সরে গিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবোরেটরী তৈরী করিয়ে সেটা অকাজের জন্যে আটক রাখা একটু বাড়াবাড়ী হচ্ছে বলে চিন্তাবিদরা মনে করলেন। সারা জীবনে যা করতে পারিনি তা শেষ বয়েসে করার চেষ্টা, এটাতো সকাল দেখেই দিন কেমন যাবে -এইরকম ইংরাজী আপ্তবাক্য মনে করিয়ে তাঁরা ব্যাঙ্গাত্বক টিপ্পনি করলেন। এই সব মনিষীরা আমার মত মানুষকে অঙ্গুলি হেলনে বানপ্রস্থে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাই "তুমি যাও বঙ্গে আর কপাল যায় সঙ্গে" মেনে নিয়ে গরু চোর মুখ করে সেসব টিপ্পনি হজম করে গেলাম। বোবার শত্রু নেই বলে আমি সাময়িক কালের জন্য সাধারন মার্জনার অধিকারী হতে পারলাম। সে যাই হোক ভাইস-চ্যান্সেলর অধুনা ডিরেক্টার আর রেজিস্ট্রার মহাশয় দ্বয়ের প্রভুত ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অধস্থন কর্মচারীদের রোজ রোজ উদ্বুদ্ধ করে শেষ পর্য্যন্ত একটা ল্যাবোরেটরী শিবপুর কলেজের সবথেকে পুরোনো এক বাড়ীর এক অংশে খাড়া করা গেলো। মাত্র দুই সপ্তাহে ল্যাবে ইন্টারনেট কনেক্সন এসে গেলো। বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তিজন অতীতে তাঁদের ল্যাবে ইন্টারনেট কনেক্সন পেতে ছ-মাসের বেশী দেরী হওয়ায় আর আমাদের এটা সল্প কালেই প্রাপ্তিতে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ী হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের ঊষ্মা প্রকাশ করলেন। বুঝলাম, অধুনা বঙ্গে এরকম কৃতিত্বের কাজ ওয়ার্টারলু যুদ্ধ জয়ের সমতুল্য । ল্যান কনেক্সনের ইনচার্জ , কমপ্উিটার সায়েন্স বিভাগের সেই অধ্যাপককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি আমার মত এক অদেখা –অজানা ব্যক্তির এই কনেক্সন এর প্রয়োজনটা বুঝতে পেরে ছিলেন। আমার স্বান্তনা এই যে বাড়ীটা কোনো নতুন প্রজন্মের গবেষক তাঁর ল্যাবের জন্যে কখনোই ব্যবহার করতে চাইবেন না তাই এক জনের কাজের জায়গা দখল করে নিয়েছি সে অনুশোচনার কোনো অবকাশ ছিলো না।

এই বাড়ীটা তৈরী হয়েছিলো এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল এস এফ ডাওনিং এর তত্বাবধানে ১৮৮৮ তে। ছেলেদের হস্টেল হিসেবে প্রথমে এর ব্যবহার হতে থাকে পরে ১৯২৪ এ প্রথম প্রিন্সিপালের স্মৃতিতে এর নামকরন করা হয় ডাওনিং বিল্ডিং। প্রায় দেড়শো বছরে এই বাড়ী না না কাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তবে রসায়নাগার হিসেবে এর ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম। যাই হোক আমার বিজ্ঞান সাধনার হাতেখড়ি কলকাতার রাজাবাজারের বিজ্ঞান কলেজে তাই সেইরকম উঁচু ছাদ যুক্ত

বাড়ীটি ল্যাবোরেটরী হিসেবে পেয়ে বেশ ভালো লাগলো। দম বন্ধ হয়ে যাওয়া পায়রার খোপের মতো ল্যাবোরেটরী বা বাসস্থান আমার ভীষণ অপছন্দ। শত বর্ষেরও পুরোনো বাড়ীর রেনোভেসনের ফেসলিফ্টিং এর জন্য নতুন করে দেওয়ালে পেইন্ট ব্যবহার করা হয়েছিলো কিন্তু তা কয়েক মাসের ব্যবধানে জায়গায় জায়গায় উঠে গিয়ে এক বৈচিত্রময় জেব্রা, বাঘ-চিতা, ও হায়েনার ছালের সম্মিলিত রূপের এক এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রনে ল্যাবের ভেতরের সৌন্দর্য অনেক গুনে বাড়িয়ে দিয়েছিলো। সে যাই হোক আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মনের আনন্দে ও নিরিবিলিতে গবেষনায় মন দিলাম। প্রিমিটিভ বিষয়ে (না তাত্বীক বিষয়ের কথা তুলছিনা কারন সেই গবেষনায় শুধু মষ্তিষ্ক লাগে আর বড়োজোর একটা পেন্সিল অন্যথায় আর্কিমিডিসের মত বালিতে ভাবনা প্রকাশের একটা কাঠির টুকরোই পর্য্যাপ্ত) কাজ করলে দু-একটা বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন খুব দামী যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রয়োজন হয়না আর জল-মাটি-কাদা-হাওয়ার ব্যবহারে বেশ একটা সবুজ-সবুজ ভাবনা নিয়ে এই পৃথিবীকে আমি আমার খেয়ালের জন্যে কলুষিত করছিনা এরকম একটা আত্মতুষ্টির ভাব জাগে। ল্যাবে ঢোকার দিনে দু এক জন গৃহ-প্রবেশের মতন একটু পূজো করার কথা কৌতুক করে বলেছিলেন তবে মিষ্টি ও চা-কফি যদি খেতে চান তার ব্যবস্থা করতে পারি বলাতে ও মন্ত্র পড়ে পূজোতে আমার আপত্তি যেনে তারা আর কিছু বলেন নি। এর পর জনা ছয় ছাত্র—ছাত্রীর সঙ্গে ভালো ভাবে গবেষনার কাজ আরম্ভ করে দিলাম। উচু সিলিং এর পুরোনো বাড়ী গরমের দিনে বেশ আরাম দায়ক তাই সবাই মিলে অনেকটা সময় ল্যাবেই কাটানো আরম্ভ করলাম। কোনো কোনো দিন রাত দশ-এগারোটা পর্য্যন্ত। মাস ছয়েকের মধ্যে একদিন সব ছেলেমেয়েরা মুখ কাঁচু মাঁচু করে আমার বসার ঘরে এসে ডাওনিং হলের এক অস্বস্থিকর খবরের ইতিহাস জানালো। তারা যা বললো তা অল্প কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে প্রিন্সিপাল ডাওনিং (অবশ্যই তাঁর আত্মা !) এখনো এই বাড়িটাতে মাঝে মাঝে তদারকি করে বেড়ান। আমি বিষ্ময় প্রকাশ করাতে তারা বলতে সুরু করলো যে সুজয় নামক তাদের এক বন্ধুর দাদু এখানে পড়তেন ও সেই সময়ে এই বাড়ীটা হষ্টেল হিসেবে ব্যবহার হত। যখন হষ্টেলের ছেলেরা লুকিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখে মাঝ রাত্রে হষ্টেলে ফিরতো তখন তারা তাদের বিছানা ও বই পত্তর কেও যেনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে দেখতে পেতো।সুজয় তার দাদুর কাছে এও শুনেছিলো যে ঘরে তালা দিয়ে গেলেও ঐরকম উৎপাত প্রায় লেগেই থাকতো। আমি বললাম ওতো পুরোনো শোনা কথা। ইন্টারনেটেও অনেকে ডাওনিং সাহেবের মৃত্যুর পরেও এই বাড়ীটির প্রতি তাঁর আসক্তির অনেক কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। তবে একটা জিনিষ পরিষ্কার জানতে পেরেছিলাম যে উনি অত্যন্ত ডিসিপ্লীনড জীবন পছন্দ করতেন তাই মনে হয় ছাত্ররা নিয়ম বহির্ভুত কিছু করলে তা পছন্দ করতেন না তাই ছাত্ররা রাত্রে পালিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখলে মৃত্যুর পরেও তাঁর অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ সেই হষ্টেলের ছেলেরা দেখতে পেতো। যাই হোক না আমি আমার গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে পারলাম যে আমরা ডিসিপ্লীনড তাই আমাদের কিছু ক্ষতি তিনি করবেন না । আমরা সবাই একমত হলাম যে এখানে ছ-মাসের উপর দিনে রাতে কাজের সময় কেউ কোনো অস্বস্থিকর পরিস্থিতির সামনে পড়েনি যা ডাওনিং সাহেবের উপর চাপানো যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসার ঘর থেকে বের হবার সময় আমি হেসে বলে ফেললামঃ “হয়তো দেখবে যে উনি আমাদের সাহায্যই করছেন বা দরকার পড়লে করবেন”। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে ডাওনিং সাহেব আমাদিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন তাই সেই ঘটনাটা আপনাদের না জানিয়ে পারছি না।

এবারে গরমের মাসে চারটি ছেলে-মেয়ে সামার রিসার্চ করতে এসেছিল। নাম গুলো লিখছি না তবে তারা গোয়া, ম্যাঙ্গালোর, ধানবাদ ও বর্ধমান থেকে এসেছিল অ্যাকাডেমী সামার ফেলো হিসেবে। তাই আর্থিক স্বাছন্দের সঙ্গে হেসে খেলে ও রবিবার দিন কলকাতার দ্রষ্টব্য জায়গা গুলি বেড়িয়ে রাত্রে ভালো রেস্তোঁরাতে নিজেদের পছন্দ মত ডিনার সেরে নিয়ম মত হোষ্টেলে রাত দশটার আগেই ফিরে আসতো। আমি তাদের হোষ্টেল নিয়ম মেনে বলেছিলাম যে রাত দশটার পর হয় ল্যাব বা হোষ্টেল এছাড়া কোথাও থাকবে না। এই সময় আমি কয়লা বা কার্বন নিয়ে গবেষনা করছিলাম তাই এদের প্রত্যেককে বিভিন্ন ধরনের কয়লায় কতটা করে গ্রাফিন আছে সেটা এক আমাদেরই বিকসিত পদ্ধতিতে আলাদা করে কোন কয়লায় কতটা আছে সেটার পরিমাপ বার করতে বলেছিলাম। দু-মাস পরে এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের কলেজে ফেরত যাবার সময় তাদের বলেছিলাম যে কাজটা ভালো হয়েছে আর আমরা একটা ভালো রিসার্চ পেপার এই কাজের মাধ্যমে পাবো। তারা সবাই ভীষন খুশী হয়ে নিজের নিজের বাড়ীতে পৌছেই আমায় ফোনে মনে করিয়ে দিয়েছিলো যে পেপারটা ছাপা হলে আমি একটা করে সেটার কপি যেনো তাদের পাঠিয়ে দিই। এক শনিবার সন্ধায় ল্যাবে একা আমি যখন প্রায় পেপার লেখাটা শেষ করে এনেছি ঠিক তখনই আমার সিনিয়র পিএইচডি ছাত্র, ভোলা, আমার বসার ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো পেপারটার জন্য যে তথ্য গুলি আমার কাছে আছে তাতে ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটির কিছু ডেটায় ভুল আছে। আমি পেপারটা লিখছি যেনে সে সঠিক ডেটাগুলি নিয়ে এসেছে। নতুন তথ্য গুলি আমি টাইপ করে বসিয়ে নিয়ে ভোলাকে বললাম যে তোমার না শনিবার বাড়ী যাওয়ার কথা সেটা না করে তুমি ঐ মেয়েটির কাজ আবার রিপিট করতে গেলে? সে কথার জবাব না দিয়ে ভোলা বলে উঠলো যে সাউথের ঐ মেয়েটির রসগোল্লা খাবার এত লোভ ছিল যে রাত প্রায় এগারোটায় সে গেষ্ট হাওসের মেসের ফ্রীজে রসগোল্লা পাওয়া যাবে কিনা তার খোজ করতো ও পাওয়া গেলে নিয়ে খেতো। আমার কথামত রাত্রে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা তা রসগোল্লার জন্যেই হোক না কেন তাতে তার আপত্তি ছিল এবং সেই জন্য মেয়েটিকে একবার বকা দেওয়ায় মেয়েটির হাতের বীকার থেকে বেশ কিছুটা গ্রাফিন অক্সাইডের দ্রবন টেবিলে পড়ে যায়। আর দিন বিশেষ ছিলোনা কাজটিকে প্রথম থেকে শুরু করার তাই সে যে কম ভ্যালুটা পেয়েছে সেটাই বসিয়ে দিয়েছে যেটা ভুল তাই সঠিক ভ্যালুর জন্য ভোলা গত কয়েকদিন রাত্রের নিরিবিলিতে মেয়েটির কাজটি রিপিট করে নির্ভুল তথ্য গুলি আমায় দিতে এসেছে। আমি সব ডেটা গুলি ঠিক করে সোমবারে পেপারটি আর একবার ভালোভাবে পড়ে জার্নালের এডিটারকে পাঠাবো ভেবে ভোলাকে ল্যাবের দরজা বন্ধ করার জন্য আওয়াজ দিলাম। না ভোলাকে পাওয়া গেল না। ল্যাবটা বন্ধ করতে করতে ভাবছিলাম যে ছেলেটা বড্ড ভালো, অন্যের ভুল ঠিক করার জন্য রাতে চুপিসারে কাজটা রিপিট করে আজকের ওর বাড়ী যাওয়ার রুটিনটা এভাবে নষ্ট করলো। এখন সাঁতরাগাছি থেকে বাড়ী যাবার সাড়ে নটার রাতের শেষ লোকাল ট্রেনটা ধরার জন্য দৌড়চ্ছে। তালা লাগিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। খাওয়া সেরে ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটিকে ভুল তথ্য দেবার জন্যে বকা দিয়ে ই-মেল করলাম।

সোমবারে পেপারটা আর একটু ঘসা মাজা করে জার্নালের এডিটরের ই-মেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েই ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটির কাছ থেকে আমার মেলের জবাবটা এই রকম পেলামঃ " স্যার,খুবই দুঃখিত ডেটাটা সঠিক না দেওয়ার জন্য। তবে সেদিন রাত্রে কাজ করার সময় হঠাৎই এক ভদ্রলোক আমায় ল্যাব ছেড়ে গেষ্ট হাউসে যাবার জন্য বকা দেন। ভেতরের ইনিসট্রুমেন্ট ঘরে তখন বাকীরা সবাই কাজ করছিল তাই আমি সেই ভদ্রলোককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে চমকে যেতে বেশ

কিছুটা গ্রাফিন অক্সাইড হাতের বীকার থেকে পড়ে যায়। সেই ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করে বলে উঠলেন যে তিনি আমার ভালোর জন্যেই রাত্রিতে এদিক ওদিক বেড়ানোর জন্য বকেছেন তবে আমার কাজটা খারাপ করার কোনো ইচ্ছা তার ছিলো না। তিনি আমাকে বলে উঠলেন যে আমার গ্রাফিনের ইল্ড তো পড়ে যাওয়ার জন্য কমে যাবে তাই আপাতত আমি যে মাত্রায় পাবো সেটাই যেন রিপোর্ট করি। আর তাঁর জন্য এই দুর্ঘটনা হওয়াতে তিনি আবার দুঃখ প্রকাশ করে আমায় বললেন যে এ বিষয়ে আমি যেন কোনো চিন্তা না করি। তিনি এও বললেন যে তিনি আপনাকে ভালো ভাবে চেনেন ও আসল ডেটা রিপোর্টের সময় তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলে নতুন ডেটার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার আর সময় ছিলোনা যাতে পুরো এক্সপেরিমেন্ট টা রিপিট করতে পারি আর সেই বয়স্ক মহাশয় যাকে আমার মনে হলো এক প্রবীন অধ্যাপক ও তাঁর ইংরাজি উচ্চারন একেবারে ব্রিটিশ সাহেবের মত তিনি পুরো ব্যাপারটা সামলে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তাঁর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন তাও বললেন। স্যার যা ঘটে গেছে তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত"। মুহূর্তের মধ্যে চমকে গিয়ে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম তবুও নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভোলাকে ডেকে শনিবার সে কখন বাড়ী গিয়েছিল জানতে চাইলাম। শনিবার দুপুরে আমি ল্যাব ছেড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই ভোলা সহ আর সবাই ল্যাবে তালা দিয়ে চলে যায় আর ভোলা তার গ্রামের বাড়ী বিকেল চারটের আগেই পৌঁছে যায় । আজ সোমবার প্রত্যেক সপ্তাহে যেমন সে বাড়ী থেকে আসে সেরকম সকালে প্রায় সাড়ে নটায় ল্যাবে ঢুকেছে। ভোলাকে শুধু বললাম যে ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটির এক্সপেরিমেন্ট টা যেনো সে রিপিট করে আমায় গ্রাফিনের ইল্ড টা জানায়- কারন লিগনাইট কয়লা থেকে আমার অনুমানে অনেক বেশী গ্রাফিন বের হতে পারে তাই ডেটা টা আমি আর এক বার চেক করতে চাই। ভোলা কোনো প্রশ্ন না করে আর এক বার পুরো এক্সপেরিমেন্ট টা রিপিট করার সম্মতিতে শনিবার রাতে আমাদের ভোলার ল্যাবে অনুপস্থিতির ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে গেল। তবুও ভোলাকে একবার পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম যে এর আগে তো তুমি ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটির স্যাম্পেল অ্যানালিসিস করোনি, উত্তরে সে জানালো সামারের কোনো ছাত্র-ছাত্রীর এক্সপেরিমেন্টাল কাজে সে সেরকম সাহায্য করেনি। এর পর ই-মেলে ম্যাঙ্গালোরের মেয়েটিকে জবাবে লিখলাম যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সেই পুরানো বন্ধুর কথা যে কখনো সখনো হঠাৎ ল্যাবে এসে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ দেখতে ভালোবাসেন। তিনি তোমার সব কথা আমায় বলেছেন আর তিনি তোমার কাজটি আবার নিজে থেকে করে আমাকে সঠিক ডেটা গুলি দিয়ে গেছেন। অন্য একটা মজার ঘটনা জানতে পেরেছিলাম যে বেশী ওজন হয়ে যাওয়ায় মাত্র ২০ খানা রসগোল্লা মেয়েটি ম্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতে পেরে ছিল আর বাকি বাড়তি গুলো কেবিন লাগেজ থেকে বের করে এয়ারপোর্টের লোকেদের খাইয়ে দিয়েছিল।

একদিন অপেক্ষা করে সোমবারের আসল ভোলার থেকে যে ডেটা পেলাম তা প্রক্সি ভোলার ডেটার সঙ্গে একে বারে মিলে গেল। পেপারটার মাস্টার কপির এ্যাক্নোলেজমেন্টে এই রকম একটা নতুন লাইন যোগ করলাম, " এই রিসার্চে প্রভুত সাহায্যের জন্য আমরা অতীতের বীশপ্ কলেজ অধুনা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিয়ুট অফ ইঞ্জিনীয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি-শিবপুর এর ভুতপুর্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় ডাওনিং এর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ "। এবারে এই সংশোধিত ফাইলের একটি কপি এডিটার কে পাঠিয়ে আগের ফাইল টাকে বাতিল করার অনুরোধ করে ই-মেল পাঠিয়ে দিলাম। গ্যালী প্রুফে ডাওনিং সাহেবকে এই কাজটি উৎসর্গ করবার ইচ্ছেটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম।

আজকের ডাওনিং হল ও আমাদের ল্যাব আর স্মৃতির ডাওনিং হল